Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মাশুকের মৃত্যু ও লায়লী-মজনুর মানবিকায়নের সংকট

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kanij Fatema
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.10
Pages	১৬৯-১৮৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মাশুকের মৃত্যু ও *লায়লী-মজনুর* মানবিকায়নের সংকট

কানিজ ফাতেমা*

সার-সংক্ষেপ : রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে লায়লী-মজনু কাব্যের বিশিষ্টতা মূলত ধর্ম-অসম্পৃক্ত মানবিক প্রেম-কাব্য রচনায়, একই সঙ্গে কাব্যটি সম্পর্কে এরূপ একটি ধারণা প্রোথিত করে দেওয়ার মধ্যেও রয়েছে লগোসেন্ট্রিজম বা পরমার্থকেন্দ্রিকতা। সুতরাং এরকম এককেন্দ্রিক ধারণার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এক্ষেত্রে কাব্য-পাঠে উত্তর-কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি শনাক্তযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। উত্তরকাঠামোবাদের আলোচনায় – একটি পাঠের মধ্যে অলক্ষ্যে জেগে থাকে বহু পাঠের সম্ভাবনা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, লায়লী-মজনু কাব্যে মানবিক প্রান্তটির আড়ালে সুফিসাধনার কথা এমনভাবে ব্যাপ্ত রয়েছে যে কাব্যের মানবিকতার দিকটি অস্বীকার না করেও এটিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ আছে যা পাঠের বহু ব্যাখ্যাত হবার সুযোগ তৈরি করে। এক্ষেত্রে লায়লী-মজনু কাব্যের একটি বিবেচ্য বিষয় পরিণতিতে মাশুকরূপী লায়লীর মৃত্যু যা পাঠককে নতুন নতুন পাঠ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। এই বিষয়টি বিবেচনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটির মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন ও আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছি।

ধর্মের দর্শন আর মানবিকতার দর্শন সমীপবর্তী হয়ে চলে না। প্রচলিত ধর্মমতগুলো পার্থিব মানুষের পারত্রিক ঈশ্বর-ভাবনাকে মানুষের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নানাভাবে ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক সন্ধান করেছে। এই সূত্রে বিভিন্ন ধর্মে জীবাত্মা-পরমাত্মা, আশেক-মাশুক প্রভৃতি যুগল পরিভাষায় লোক এবং লোকোত্তরের সেতু গড়ে উঠেছে; যদিও এই মিলন-প্রত্যাশী যুগল ভাবনায় চূড়ান্ত মিলন অসম্ভব। এরূপ বিশ্বাসে আস্থাশীল ধর্মমতগুলো সাধারণত তাদের চিন্তাকাঠামোটি সাজিয়ে নেয় এভাবে : জীবাত্মা সর্বদাই পরমাত্মার সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল কিন্তু তাদের ইহলোক অনিঃশেষ অপ্রাপ্তির মধ্যে দিয়েই অবসিত হয়। মিলনের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দূরত্বের মধ্যে বেদনা থাকে, যা আশেক-মাশুক তত্ত্বনির্ভর সুফিবাদেও বিদ্যমান। আর

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সুফিবাদ-অনুপ্রাণিত এই বেদনামথিত কাব্য-উপকরণকেই আশ্রয় করেছেন মধ্যযুগের রোমান্স-রচয়িতা অনুবাদক কবিরা, কাব্যের পরিণতিতে দেখিয়েছেন নর-নারীর মৃত্যু। প্রচ্ছন্নভাবে বলতে চেয়েছেন যেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ চিরমুক্তি পেয়ে পরমাত্মার সাথে লীন হতে পারে। দৌলত উজির বাহরাম খানের (১৫৪৫-৫৩ খ্রি.) *লায়লী-মজনু* কাব্যেও লায়লী ও মজনু পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাদের জীবদ্দশায় মিলন ঘটেনি। তাহলে, সুফিবাদে আস্থাশীল বাহরাম খান কি ধর্মবিশ্বাসকেই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে রেখেছেন – এরূপ আশংকা তৈরির সুযোগ থাকলেও উত্তর-কাঠামোবাদী সমালোচনা রীতি অনুসারে পাঠের বহুব্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনাকেও অগ্রাহ্য করা চলে না। বর্তমান প্রবন্ধে মূলত *লায়লী-মজনু* কাব্যের ব্যাখ্যাত হবার সম্ভাবনাকে নিরূপণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বলে বিবেচিত হয়েছে মাশুকরূপী লায়লীর মৃত্যু। পার্থিব জীবনের অবসান লায়লীকে কীভাবে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন করছে? লায়লীর ঈশ্বরায়ণ ও মানবিকায়ন কি মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করছে? নাকি এই মৃত্যুই কাব্যকে দার্শনিক উচ্চতা প্রদান করেছে! এসকল প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

অনূদিত সাহিত্যের উত্তর-কাঠামোবাদী অবলোকন

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের ধারা প্রতিষ্ঠা করা। বাংলায় যেসব রোমান্সকাব্য রচিত হয়েছে তাতে ফারসি ও হিন্দুস্তানি কাব্যের ভাবানুবাদ সুস্পষ্ট। অনুবাদে উৎস পাঠ (source text) ও লক্ষ্য পাঠ (target text)-এর মধ্যকার সম্পর্ককে যুগ্ম বৈপরীত্যের ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেখানে এর একটি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হয়, অন্যটি অধীন থাকে। এরূপ ধারণাকে উত্তর-কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব। অনুবাদ বিষয়ে উত্তর-কাঠামোবাদী দার্শনিক জ্যাক দেরিদা মনে করেন, "'অনুবাদ'কে এমন অধস্তন ভাবা সঙ্গত নয়। অনুবাদও একটা লেখন, সেই লেখন মূল টেক্সটের মতো মূল্যবান– কেননা 'মূল-পাঠ' বলে কিছু নেই–" (সূত্র : সালাহউদ্দিন, ১৯৯৬ : ১৪৬)। তাহলে অনূদিত সাহিত্যকেও স্বতন্ত্র ও ভিন্ন পাঠের মর্যাদা দিয়েছেন দেরিদা। এক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদতত্ত্বের আলোচনায় পার্থক্যবোধের প্রসঙ্গটি উঠে আসে। কেননা, অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রধান উপকরণই হলো ভাষা যা মূলত একটি "চিহ্ন ব্যবস্থা, আর চিহ্নের অর্থ চিহ্নের সাদৃশ্যে নয় পার্থক্যেই নির্ণেয়। সেজন্য অনূদিত পাঠ অবশ্যই ভিন্ন একটা পাঠ এবং সেই ভিন্নতা গুরুত্বপূর্ণ।" (সালাহউদ্দিন, ১৯৯৬ : ১৪৬) উত্তর-কাঠামোবাদ মূলত পাঠ ও অর্থের পরিবর্তমান তাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে। উত্তর-কাঠামোবাদে লিখিত পাঠে অর্থের কোন স্থির সীমারেখা নেই; বরং "it is the critic's task to decipher, to seeing it as irreducibly plural, an endless play of signifiers which can never be finally nailed down to a single centre, essence or meaning." (Eagleton, 2008:

120) ফলে সাহিত্য কোনো একটি অর্থে কেন্দ্রীভূত থাকে না বিধায় উত্তর-কাঠামোবাদকেন্দ্রিক অনুবাদতত্ত্বের এরূপ ধারণায় বাংলা রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান বিচার করতে গেলে একে নতুন পাঠ হিসেবেই বিবেচনায় নিতে হবে। ফারসি ও হিন্দুস্তানি কাব্যধারা-অনুপ্রাণিত বাংলা রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের প্রধান উপাদান নর-নারীর প্রেম হলেও তা প্রায়শই দর্শনমুখ্য এবং লেখকের জ্ঞান ও বিশ্বাস পরিস্রুত। অন্যদিকে বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে রোমান্সকাব্য কেবল উত্তর-কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই নয়; বরং কাব্যের কাহিনি ও রচনাকৌশলের কারণেও অনূদিত সাহিত্য উৎস-পাঠ থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবি রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "মানবীয় উপকরণগুলির ওপর জোর দিয়ে আখ্যানে বৈচিত্র্য আনলেও সুফীদের মৌলজিজ্ঞাসা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক, মানবিক মহিমার প্রতিষ্ঠা, জীবে প্রেম প্রভৃতি প্রসঙ্গই দেশীয় পরিবেশে স্থাপিত বিদেশী কাহিনীর আড়ালে তত্ত্বরূপ লাভ করেছে।" (ভীষ্মদেব, ২০০৪ : ২০৩) এখানে উৎস পাঠ থেকে তত্ত্বানুগত্যের গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অনূদিত সাহিত্য কেবল নতুন একটি পাঠই হয়ে ওঠেনি; একইসঙ্গে কাব্যের মধ্যে মানবীয় উপকরণ ও সুফিদের আশেক-মাশুক তত্ত্ব প্রয়োগের ফলে পাঠের বহুমাত্রিক সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। তবে সুফিবাদ যেহেতু "বৈপ্লবিক মানবিকতাবাদে পরিপূর্ণ একটি মতাদর্শ – যার প্রধান লক্ষ্য আদর্শের ক্ষেত্রে ত্রুটিবিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা – মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল ভেদাভেদ ও বিদ্বেষকে লুপ্ত করে, শুধুমাত্র ঈশ্বর-প্রেমকে সম্বল করে একটি জনগণতান্ত্রিক হৃদয়বাদের প্রতিষ্ঠা করা।" (হাফিজ, ১৯৭৬ : ৩১) সেহেতু অনূদিত সাহিত্যে সুফিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই কি তা মানবিক হয়েছে নাকি কাব্যের মধ্যে মানবিকতা ভিন্নভাবে এসেছে সেটাও বিবেচনার অবকাশ রাখে।

সুফিবাদ একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। এর মূল সাধনাটি চলে স্রষ্টা আশেক ও সৃষ্টি মাশুকের প্রেম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সুফিরা বিশ্বাস করেন, যতক্ষণ মাশুক বা জীবাত্মা দেহের সীমাকে অতিক্রম করতে না পারে ততক্ষণ তা পরমাত্মা হতে পৃথক থাকে। আর এই পৃথকত্বের কারণে "উভয়ের ভিতর প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কের পরিকল্পনা সম্ভবপর। সুফীর এই দ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক প্রেম কুরআনের শিক্ষার সহিত ঐক্য রাখে। কুরআনেও বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা প্রত্যাশা করেন।" (বরকতুল্লাহ্, ২০১১ : ৪৫) তাই আল্লাহ্র অনুধ্যান ও তাঁর প্রেমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কারণে সুফি-দর্শনকে প্রেমদর্শন নামে অভিহিত করা হয়। ভারতীয় আরেকটি লোকজ মত বৈষ্ণববাদ সুফিবাদের মতো মনে করে, জীবাত্মা পরমাত্মার খণ্ডাংশ। সুফিবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বৈষ্ণবমতের মিল থাকলেও পার্থক্যও সুস্পষ্ট। বৈষ্ণববাদে জীবাত্মা রাধা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ। অন্যদিকে সুফিবাদে "আত্মাই প্রেমিক আর পরমাত্মা তার প্রেয়সী।" (বরকতুল্লাহ, ২০১১ : ৪৫) মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা স্রষ্টা বা পরমসত্তার সাথে মিলিত হতে

পারে। তাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাই সুফিদের ব্রত। সুফিদের মতে, আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে ফানাফিল্লাহ (আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান করা) এবং ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ (আল্লাহর সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিলীন হয়ে যাওয়া) স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এজন্য আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির সাধনাকে 'তরিকত' বা আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ বলা যায়।

সুফিবাদে যেহেতু মানুষকে আশ্রয় করে অধ্যাত্মচিন্তা বিকশিত হয়, সেহেতু এই চিন্তার আধার যে মানুষ তারও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। এরই সূত্র ধরে বলা যায় যে, ইউরোপে রেনেসাঁস পরবর্তীকালে মানুষকেই মুখ্য বিবেচনা করে জন্ম নেয় ও বিকশিত হয় মানবতাবাদ। এ মতবাদে সমস্ত আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতাকে পরিহার করে মানুষকেই সব কিছুর উর্ধ্বে বিবেচনা করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ এক নতুন স্বাধীন চেতনায় উজ্জীবিত হয়। ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে মানুষকেই সব কিছুর ওপর স্থান দেয়। ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) ও অগাস্ট কোঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭)-এর চিন্তা ও দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লুদভিগ ফয়েরবাখ (১৮০৪-১৮৭২), চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রেডেরিখ নিৎশে (১৮৪৪-১৯০০) ও সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) বাস্তবতার এমন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন যেখানে পরমসত্তা নয়, বরং উত্থান ঘটে মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের। এমন মতের অনুসারী আর্থার শোপেনহাওর (১৭৮৮-১৮৬০); যিনি মনে করেন, 'no Absolute, no Reason, no God, no Spirit at work in the world: nothing but brute instinctive will-to-live.' (সূত্রঃ Karen Armstrong, 1993: 173) কিন্তু মানুষের অধিবিদ্যক চিন্তার কারণেই পরম সত্তা হয়ে ওঠেন অসীম, সর্বশক্তিমান, পবিত্র; অন্যদিকে মানুষ হয়ে ওঠে সসীম, দুর্বল, পাপী। মানবিক চেতনা-কাঠামোতে (paradigm) চিন্তার এই যুগ্ম-বৈপরীত্যের প্রথাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেন জ্যাক দেরিদা তাঁর বহু প্রচল ভাষাভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্ব 'বিনির্মাণবাদ'-এ। দেরিদা মনে করেন, অধিবিদ্যক চিন্তার কারণেই ভাষাকেন্দ্রিক মানুষের জ্ঞান কখনোই সত্যের সন্ধান পায় না। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসও এমন একটি অধিবিদ্যক ধারণা যেটি মানুষকে দাসত্বের কবলে আটকে ফেলে; যে কারণে জার্মান দার্শনিক আর্নেস্ট ক্যাসিরার, অগাস্ট কোঁৎ 'মানবতাবাদ'কে মানুষকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত হবার অন্যতম পন্থা হিসেবে বিবেচনা করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুফিবাদ ও মানবতাবাদ দুটো তত্ত্বেই মানুষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও মানবতাবাদী ধারণায় ঐশী ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয় কিন্তু সুফিবাদ ঠিক এর উল্টো। সুফিবাদে ঈশ্বর ও মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হতে প্রত্যাশী। সুফিরা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে খোঁজার চেষ্টা করে। ফলে রোমান্স-কাব্যে

অধ্যাত্মচিন্তা মানব-আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, যা প্রকারান্তরে এই ধারার কাব্যে সঞ্চার করেছে বিশেষ শিল্পবৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই মানব-ভাবনার লক্ষ্য আধ্যাত্মিক। তাই ইউরোপীয় মানবতাবাদী প্রবণতার সঙ্গে এর ব্যবধান রয়েই যায়।

শিল্পীমানসে অধ্যাত্মচিন্তা ও শিল্পচিন্তার দ্বন্দ্ব

একটি কাহিনিকে একজন কবি যখন কবিতায় ধারণ করেন তখন তাঁর বিশ্বাস, শিল্পচেতনা একীভূত হয়। এই একীভবনকে ভাষা-নির্ভর একটি জৈব কাঠামো প্রদান করা হয়। রোমান্সের আখ্যান উৎসকে বাংলা ভাষায় পুনর্বিন্যস্ত করতে গিয়ে দেখা গেছে, কবির অধ্যাত্মচিন্তা ও স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পচিন্তা – এই দুই ধারা একত্র হওয়া সম্ভব হয়নি। মধ্যযুগীয় সমাজ-মানসে ধর্মীয়চেতনা অনেক বেশি প্রবল। যাঁরা এ কাব্য লিখেছেন তাঁরাও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ধার্মিক ছিলেন। সুতরাং ধর্মকে বাদ দিয়ে কোনো সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব ছিল। তাহলে শিল্প এখানে হয়ে যায় একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। একইসঙ্গে কবি হিসেবে মানবিকতাবোধ থেকেও তাঁরা বিচ্যুত হননি। অথচ এই দুই-এর মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে এই বিরোধের অপনোদন হতে পারে রূপকতত্ত্বের মাধ্যমে। রূপকতত্ত্বের সুবিধাটা হলো – একটি বস্তুর মধ্যে আরেকটি বস্তুকে প্রতিস্থাপিত করা, একের মধ্যে একাধিকের প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা। ফারসি ও ভারতীয় রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানে এই সুবিধাটা রয়েছে যেখানে অধ্যাত্ম সাধনার রূপকী ব্যাখ্যা ছাড়াও কাব্যগুলি নিছক উপাখ্যান হিসেবেও টিকে থাকতে পারে। কিন্তু বাংলা রোমান্স কাব্যে অনেক ক্ষেত্রেই এই ঋজু বিভাজনরেখা কাব্যের মধ্যে নেই যেখানে অধ্যাত্মচিন্তা ও শিল্পভাবনা – বিপরীতমুখী এই দুই ধারাকে একই সরলরেখায় সমীকৃত করা যায়। ফলে কাব্য পাঠকালে পাঠককে একধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বও কাব্যের শিল্পসফল হওয়ার সূতিকাগার। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কবি কাব্য রচনা করছেন, সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন হলেই বরং কাব্যের শিল্পসাধনা ব্যর্থ হয়। একইসঙ্গে এই দ্বন্দ্বও একটি পাঠকে বহুব্যাখ্যাত হবার সুযোগ তৈরি করে দেয়। এরই সূত্র ধরে *লায়লী-মজনু* কাব্যে উত্তর-কাঠামোবাদী অবলোকন একটি শনাক্তযোগ্য সত্তা হয়ে উঠতে পারে।

লায়লী-মজনু কাব্যে উত্তর-কাঠামোবাদী অবলোকন

ফারসি কবি জামির কাব্যের ভাবানুবাদ *লায়লী-মজনু* শীর্ষক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান এ ধারার কাব্যের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সুফিবাদের ধারা অক্ষুণ্ন থাকলেও *লায়লী-মজনু* কাব্যে রয়েছে মানবিক প্রেমময়তা। তবে একটা সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচকদের রচনায় *লায়লী-মজনু* কাব্যের আধ্যাত্মিকতার দিকটি অস্বীকার না করা হলেও এটি কত বেশি মানবিক তা প্রমাণের আগ্রহ লক্ষ

করা গিয়েছিল। আহমদ শরীফের মতে, "এ কাব্য বাল্যপ্রেমে অভিশপ্ত দুই বিরহী হৃদয়ের রক্তক্ষরা বেদনার জমাট অশ্রু।" (২০১৪ : ৪১) তবে ক্ষেত্রগুপ্ত *লায়লী-মজনু* কাব্যকে মানবিক প্রণয়কাব্য বলা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, *লায়লী-মজনু* কাব্যে মানবিকতার উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিত বিষয়ক কোনো সরল মেরুকরণে পৌঁছানোর সুযোগ নিতান্তই সীমিত। বিশেষ করে ক্ষেত্রগুপ্তের বক্তব্যকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তা যথেষ্ট পরিমাণ যুক্তি সহকারে উপস্থাপিত হয়নি এবং গুণিজনের উপলব্ধিজাত মন্তব্য হিসেবেই স্থান পেয়েছে। উত্তর কাঠামোবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে বলা যায় যে, ক্ষেত্রগুপ্তের বিবেচনা কেন্দ্রিকতা আক্রান্ত। অপরদিকে আহমদ শরীফ যেভাবে নর-নারীর মানবিকতাকে মুখ্য বিষয় হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা-ও কেন্দ্রিকতা মুক্ত নয়। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধসূত্রে আমাদের বিবেচনা এই যে, কোনো প্রকার একপাক্ষিক আকল্পকে (Hypothesis) আশ্রয় করে *লায়লী-মজনু* কাব্যের বিশ্লেষণ যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এই কারণে এই প্রবন্ধে উত্তর কাঠামোবাদের 'মুক্ত খেলা' ধারণাটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সূত্রে আমরা দেখাতে চেয়েছি যে, এ কাব্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, মানবিকতাবোধ এবং নারী পুরুষের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনভাবনার স্বতন্ত্রমাত্রিক তাৎপর্য বিদ্যমান রয়েছে। শুধু তাই নয় উল্লিখিত উপাদানসমূহের একটি দ্বান্দ্বিক সমাবেশ এ কাব্যে ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রবন্ধের এ পর্যায়ে *লায়লী-মজনু* কাব্যের আলোচনায় মানবিক প্রান্তটির আড়ালে আধ্যাত্মিকতার দিকটি কীভাবে ব্যাপ্ত রয়েছে তার অনুসন্ধান করা হবে। এই দ্বান্দ্বিকতাকে বোঝানোর জন্য উত্তর-কাঠামোবাদী ধারণার সারাৎসার অবলোকন করা প্রয়োজন।

লায়লী-মজনু কাব্যে সুফিবাদের যে ধারা অন্তর্বাহিত তা লেখকের আন্তঃপ্রেরণা। সামন্তবাদী সমাজ-কাঠামোর অভ্যন্তরে রাজসন্তুষ্টিকে বিবেচনায় রেখেই এই কাব্য রচিত হয়েছে; নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এর শিল্পরীতি ও শিল্পরুচি। এর ফলে, রাজদরবারের প্রেমকাহিনি হিসেবে *লায়লী-মজনু* কাব্যের প্রথমদিকে নর-নারীর দেহজ প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। নর-নারীর পরস্পরের প্রতি মিলনাকাঙ্ক্ষার ভাবানুভূতিতে যে মানবপ্রেমের জন্ম সেই ভাববোধে তাড়িত হয়েই পাঠশালায় লায়লী-মজনু পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়েছে। লায়লী ও মজনুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, পারস্পরিক অনুরাগ, পারিবারিকভাবে নিষেধাজ্ঞার কারণে উভয়ের বিচ্ছেদ, পুনরায় সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা, ধৃত মজনুকে প্রহার করা ও তার পাগল হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনা মানবীয় প্রেমের স্বাভাবিক রূপকে প্রকাশ করে। এছাড়া লায়লীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লায়লী-চরিত্র নির্মাণে মানবিক কাঠামোকে মূর্ত করেছেন কবি। লায়লীর অষ্ট-অঙ্গের বর্ণনা, লায়লীর মধ্যে কামচেতনা দানে হেতুবতীর প্রচেষ্টা ও উভয়ের বাদ-প্রতিবাদমূলক সংলাপ, এছাড়া বারমাসি-চৌতিশার দেশজ কাঠামোর মধ্যে লায়লীর

কামনা-বাসনার অনুভূতি তুলে ধরে লায়লীকে কবি অনেক বেশি মানবিক করে তুলেছেন। 'লায়লীর যৌবনোদ্বেগ'-এর প্রকাশে কবি প্রকৃতিতে বসন্তের আগমনে মিলনমুখর ভোমর-ভোমরি, অলি-পিক, শারী-শুক প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যার মধ্য দিয়ে লায়লী অনেক বেশি রক্ত-মাংসের মানবী হয়ে উঠেছে –

ভোমরা ভোমরী জোড়ে মধু করে পান।
তা দেখিয়া বিরহীর না রএ পরাণ॥
মুঞ্জরিল ভুবন-মোহন তরুগণ।
শারীশুক পক্ষীসব উল্লসিত মন॥ (লায়লীর যৌবনোদ্বেগ)

তবে লায়লীর বিপরীতে মজনু চরিত্র নির্মাণে কবি কিন্তু এতখানি মানবিকতা সংসক্ত নন। এর পেছনে বাহরাম খানের সচেতন অভিপ্রায় ছিল বলে মনে করা যেতেই পারে। শুরুতে যদিও লায়লীর প্রতি মজনুর প্রেমের ক্ষেত্রে তার রূপজ দৃষ্টিভঙ্গি তাকে মানবীয় করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু লায়লীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করার সময় ধরা পড়ে মালিকের বাড়ির দ্বারিক কর্তৃক প্রহৃত মজনুর উন্মত্ত অবস্থায় উপনীত হবার পর থেকেই কাব্যের কাহিনি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। মজনুর পাগল হওয়াকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ থাকলেও বার বার লায়লীর নাম-স্মরণ নিছক মানসিক আঘাত বলে ব্যাখ্যাত হতে পারে না। এখানে লক্ষণীয় –

কথক্ষণে হৈলা যদি মজনু চেতন।
জাগিতে লায়লী নাম করিলা স্মরণ॥
নয়ান মেলিয়া নিরীক্ষএ অনিমেষে।
পিতাক চিনিতে নারে বিভোল বিশেষে॥ (মজনুর জন্য পিতা-মাতার বিলাপ)

মজনু যে লায়লীর ধ্যানে মগ্ন উদ্ধৃত অংশে তারই প্রকাশ ঘটেছে। লায়লীর ও মজনুর প্রেমের ক্ষেত্রেও মজনু লায়লীর জন্য পাগল হয়ে যাওয়া ও লায়লীর নাম স্মরণ করার এই দিকটিকে সুফিমতানুসারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সুফিরা আল্লাহর প্রেমসাধনায় নিমগ্ন থাকেন। তাই সুফিরা ধ্যানের মধ্য দিয়েই তাঁর সন্ধান করে চলেন। সুফিরা যখন আল্লাহর ধ্যান করে তখন জাগতিক কোনো বাধাবিপত্তি তাদের বিচলিত করতে পারে না। ঠিক তেমনি মজনুও লায়লীর জন্য পাগল হয়ে বার বার লায়লীর নাম স্মরণ করলেও পিতা-মাতাকে চিনতে পারে না। লায়লীর প্রতি মজনুর প্রেমের এই তীব্রতা বা ব্যাকুলতার আরও কয়েকটি বিশিষ্ট রূপ কাব্যে লক্ষণীয়। যেমন, লায়লীর পায়ের ধূলিকণার কাজল মজনুর চোখে লাগানো, লায়লীর পোষা কুকুর 'সুন'-এর গলার ডোর তার পরিধেয় বস্ত্রের সঙ্গে বেঁধে রাখা, কুকুরের পদচুম্বন, লায়লীর প্রেমে পাগল হয়ে নগ্নাবস্থায় নজদ বনে ঘুরে বেড়ানো, পশু-পাখির সাথে অবস্থান– প্রেম-উন্মাদনার এই ভাবটির সাথে সুফিদের 'ফানা' অবস্থার সাজুয্য রয়েছে। সুফিরা

সর্বদাই আল্লাহর ধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। জাগতিক কোনো বিষয়-সম্পদ তাঁদের আকৃষ্ট করে না। জাগতিক চাওয়া-পাওয়া, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে দমন করে আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছতে হবে – সুফিধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কবি মজনুকে সমাজ-সংসার বিমুখ করেছেন। এছাড়াও নিজের মধ্যে দৃঢ়তা আনতে যোগীর নিকট মজনুর সংকল্প জ্ঞাপন – সুফিসাধনার উল্লেখযোগ্য দিক। এটি সুফিবাদের 'তরিকত' বা মর্মমুখী ধারার অন্তর্ভুক্ত। তরিকত ধারায় সুফিবাদীরা পির-মুর্শিদের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের আশা করেন। ফলে পির ও শিষ্যের পরম্পরা সুফিবাদীদের এক প্রধান অবলম্বন। এর মূল লক্ষ্য "কামনা বাসনার সীমান্তগুলিকে চিনে নেয়া, ইন্দ্রিয়াদিকে নিয়ন্ত্রণ করা, ধর্মীয় শ্লোকাবলির আবৃত্তি, জিক্‌র ও ধ্যানের মাধ্যমে ফানা-ফি-শেখ অর্থাৎ শেখের ভিতরে বিলয়প্রাপ্ত হওয়া।" (হাফিজ, ১৯৭৬; ৩১) এখানে পির-মুর্শিদের একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় যাকে বলা হয় রাবিতা বা সংযোগ সূত্র। এক্ষেত্রে মুরিদকে বিনা বাক্য ব্যয়ে, বিনা দ্বিধায় পিরের আদেশ-নিষেধ মেনে নিতে হয় এবং পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সত্তার ভিন্ন বলয়ে নিজেকে স্থাপন করতে হয়। তাই মজনুর পিতা যখন মজনুকে গুরুর কাছে নিয়ে যায়, তখন গুরুর কাছে মজনু প্রার্থনা জানায় –

অসার সংসার মধ্যে ভাবমাত্র সার।
ভাব বিনে ভাবকের গতি নাহি আর॥...
মাতাপিতা ইষ্টগণ নাহি মোর দাএ।
জীবন সম্পদ সুখ মনেতে না ভাএ॥
এহি বর মাগি মাত্র চরণ কমলে।
সদাএ দহিতে তনু বিরহ অনলে॥ (যোগীর নিকট মজনুর সঙ্কল্প জ্ঞাপন॥)

এখানে যোগীর কাছে বিরহ কামনা করে মজনু। কেননা বিরহানলে পুড়ে প্রেম খাঁটি হয়। এজন্য কবি বিরহকে অনলের সাথে তুলনা করেছেন। অগ্নি বা অনল দিয়েই আলো জ্বালাতে হয়। যেমনটি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন *গীতাঞ্জলি* কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতায় – 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো, বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো'। মিলন নয় বিরহই সত্তার স্বরূপকে চিহ্নিত করে যার অন্য নাম অবাধ মুক্তি। "বিরহ আছে বলেই মানুষ মিলনের দিকে অগ্রসর হবার কথা ভাবতে পারে, এবং অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যেই রয়েছে তার মুক্তি এবং আনন্দ বা হরষ।" (জগন্নাথ চক্রবর্তী, ১৯৮৮ : ৪৭) বিরহের মধ্যে সুফিরা পান মাশুকের প্রেম। তাই "মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী-বৈষ্ণবের সাধ্য। তাই সূফী গজলে ও বৈষ্ণব পদে আমরা মিলন-পিপাসু বিরহী আত্মার করুণ কান্নার ধ্বনি শুনতে পাই।" (হাই, শরীফ, ২০১০ : চ) *লায়লী-মজনু* কাব্যেও ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য মজনুর যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্যের প্রয়োজন তাকে কাব্যে রূপ দিতে গিয়ে দেখানো হয়েছে,

প্রেম বিরহ দিয়ে ঘেরা। কেননা "বিরহের মধ্যে লায়লী অশরীরী রূপে সারা অন্তর্লোকে ছড়িয়ে পড়েছে, তার বাহ্যিক দেহের কামনা তুচ্ছ হয়ে গেছে। যেখানে লায়লীর প্রেমসত্তার অধিষ্ঠান বিশ্বময় এবং মজনু যখন সেই বৃহতের স্বাদ পেয়েছে, তখন সেখানে মানবী লায়লীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। প্রেমের এ পরিণতি স্পষ্টত লৌকিক নয়, অলৌকিক; তত্ত্বের ভাষায় প্রেম, জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম। পরম যিনি তাকে তো আর বস্তুরূপে পাওয়া যায় না; ধ্যানের জগতে কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।" (ওয়াকিল আহমদ, ২০১২ : ৩৭-৩৮) আর আরাধ্য বস্তুর সাধনায় প্রকৃত প্রেমিককে এসব বিরহ সহ্য করে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাই কঠিন পরীক্ষার ব্রত হিসেবে দেহকে নিয়ন্ত্রণের সাধনা করে মজনু। দেহকে নিয়ন্ত্রণের সাধনায় মজনু নজদ বনে চলে গিয়ে যোগাশ্রয়ী হয় –

পঞ্চবৈরী বিনাশিয়া এক মন কাএ।
পরম সমাধি হৈয়া রহিল তথাএ॥
শয়ন ভোজন সুখ সকলই হারাই।
লায়লীর রূপ মনে রহিল ধেয়াই॥
নয়ান শ্রবণ মুখ মুদিয়া সদাএ।
নিঃশ্বাস ধরিয়া রূপ মনেত ধেয়াএ॥
চিবক কণ্ঠেতে দিয়া জোগাসনে বসি।
লায়লীর রূপ নিরীক্ষএ অহর্নিশি॥
দোলন বোলন নাহি নীরস নয়ন। (মজনুর জন্য পিতা-মাতার বিলাপ)

এখানে বাহরাম খানের ধর্মবিশ্বাস থেকেই মজনুর যোগসাধনার একটি দৃশ্যকল্প উঠে এসেছে। যোগ হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে শারীরিক এবং মানসিক নিয়ন্ত্রণ। যোগের মূল লক্ষ্য ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ। যোগসাধনার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে– যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণ, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি। উল্লিখিত কাব্যাংশে 'পঞ্চবৈরী' বলতে 'যম'কে বোঝানো হয়েছে। 'যম' বলতে বোঝায় অহিংস, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি বিষয় পরিহার করে ধ্যানে নিমজ্জিত হয়েছে মজনু। এখানেও দেরিদার মতকে সমর্থন করে বলা যায়, শব্দকে দ্যোতক (signifier) এবং এর পেছনের ঘটনাকে যদি দ্যোতিত (signified) ধরা হয় তাহলে এদের মধ্যে আসলে কোনো সম্পর্ক নেই এবং শব্দ বাস্তবকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। এখানে দ্যোতক 'পঞ্চবৈরী' শব্দের সাথে অহিংস, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ– এই পাঁচটি বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং 'পঞ্চবৈরী' শব্দটি দ্যোতিত হয়ে যোগসাধনার একটি পদ্ধতি 'যম'কে বোঝানো হয়েছে। এভাবে শব্দ দ্বারা বাস্তবকে প্রকাশ করতে গেলেই নতুন শব্দ যোগ করতে হবে। প্রতিটি শব্দই আর কেন্দ্রে থাকছে না, তার পূর্বাপর শব্দগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পার্থক্য রচনা

করছে। একইভাবে নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধারণ, ধ্যান ইত্যাদি ভাষাচিহ্নও দ্যোতক ও দ্যোতিতের ধারণাকে উপস্থিত করে শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ ও লায়লীর রূপকে অন্তরে ধারণ করে মজনুর যোগাশ্রয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে তার অধ্যাত্মসাধনার একটি স্বরূপকে নির্দেশ করেছেন কবি। এভাবে যোগাশ্রয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তিগুলিকে দমন করতে সক্ষম হয় মজনু –

উরুভেদি তরু হৈল নাহিক চেতন॥
শরীর নগরে তান লাগিল ফাটক।
কাম ক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক॥ (মজনুর জন্য পিতা-মাতার বিলাপ)

এই বর্ণনাংশটি একটি প্রতীকী চিত্রকল্প। এখানে মজনুর সাধনা বৃক্ষের মতো স্থির, অচঞ্চল। সাধনা করতে গেলে মন বা চিত্তকে বৃক্ষের মতো স্থির হতে হয়। অস্থির ও চঞ্চল মন নিয়ে সাধনা হয় না। এজন্য বাইরের বিষয়গুলি থেকে ইন্দ্রিয়কে সরিয়ে আনতে হবে।

তাহলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, কাব্যের পুরো আখ্যান জুড়ে মজনু চরিত্র নির্মাণে বাহরাম খান সর্বদাই তত্ত্বাশ্রয়ী হয়েছেন। যেখানে কবি স্বতঃস্ফূর্ত সেখানে মানবিকতা মুখ্য; যেখানে কবি সচেতন, ধর্মবিশ্বাসপ্রবণ, সেখানে তাঁর রচনা তত্ত্বমুখ্য হয়ে উঠেছে। আর এটা করতে গিয়েই মজনুকে জগতের সব কিছুকে ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায়, নানা ধরনের কায়িক সাধনায় লিপ্ত থাকতে হয়েছে। সুফিধর্মমতে, জগৎকে ভুলে যেতে হবে, জগতের প্রতি মায়া কাটাতে হবে, না হলে সাধনায় জয়লাভ করা যায় না। সুফি সাধকরা তাদের সাধনমার্গকে সব সময় জটিল ও দুর্গম করেছেন যা মানুষের স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও আনন্দময় জীবনের পরিপন্থী। ফলে আধ্যাত্মিকতার ধারণার সঙ্গে জীবনের সজীবতার কোনো সম্পর্ক নেই। বলা যায়, মানুষের আধ্যাত্মিকতার ধারণাটাই জটিল। মানুষ খুব যান্ত্রিকভাবে প্রাত্যহিক আচার প্রতিপালন করে কিংবা অন্য কোনো রিচ্যুয়ালের মাধ্যমে পরমাত্মার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। তাহলে মানুষের তৈরি করা অচলায়তনে বন্দি হয়ে আছেন পরমাত্মা নিজেই। রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানে দৌলত উজির বাহরাম খান ওই সময়ে বসে যুগান্তকারী চিন্তা করেছেন এমনটি ভাবার যৌক্তিক সুযোগ নেই। এখানে পাঠের একটি উত্তর-কাঠামোবাদী বিশ্লেষণ সম্ভব। এখানে পরমাত্মা বা আধ্যাত্মিকতার স্থির ধারণাকে ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ আছে। আধ্যাত্মিকতার ধারণাটাই প্রথাগত সমাজ-মানসের ধারণা, একটি অধিবিদ্যক ধারণা। পরমাত্মাকে কাছে রাখতে হলে তাঁকে মুষ্টিবদ্ধ করতে হয় অথবা বেঁধে রাখতে হয়। তাঁকে কাছে রাখার জন্য মানুষ উপাসনালয় নির্মাণ করে, বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান করে। পরমসত্তা মুক্ত থাকলে মানুষকে এত অনুশাসনের মধ্যে জীবন-যাপন করতে হতো না। একটা বাঁধা-ধরা কাঠামোর মধ্যে থাকতে হতো না। আপাতভাবে মনে হয় সর্বশক্তিমানই আমাদেরকে

দিয়ে এটা করাচ্ছেন। কিন্তু "Life was an endless dialogue with God, which does not endanger our freedom or creativity since God never tells us what he is asking of us. We experience him simply as a presence and an imperative and have to work out the meaning for ourselves." (Karen Armstrong, 1993 : 166) অর্থাৎ, মানুষের পাপ-পুণ্যের ধারণা, শাস্তিভোগের আশংকা ও প্রায়শ্চিত্তের ধারণা থেকেই সে অনেক বেশি ঈশ্বরপ্রবণ হয়ে ওঠে। প্রাচীন প্যাগান ধর্মবিশ্বাস থেকে বিমূর্ত একেশ্বরবাদ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই প্রেক্ষাপটটি মূলত অভিন্ন। তাই আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আত্মিক শান্তি লাভের মাধ্যমে মানুষ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বর আদৌ কি মানুষের জন্য এত নিয়মের নিগড় গড়ে তোলেন! এমনও তো হতে পারে যে মানুষ চাইলেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারত। হয়ত মানুষই নিয়মগুলি তৈরি করেছে; আর মানুষের সৃষ্ট নিয়মের ফাঁদে পরমাত্মা নিজেই ধরা পড়ে গেছেন।

লায়লীর পরিণতি : মাশুকের মৃত্যু

অদৃশ্য পরমাত্মার প্রতিতুলনায় ধর্মগুলো একটি বিকল্প জগতের অনুসন্ধান করে। এই বিকল্প জগৎ সন্ধান করতে গিয়ে সুফিবাদে বিমূর্ত পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে নারীকে কল্পনা করা হয়েছে। এরূপ চিন্তা কিছুটা হলেও চর্যাপদ সূত্রে আমরা পেয়েছি। লোকায়ত বাউল ভাবনাতেও নারী পরম আরাধ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বৈষ্ণব মতবাদে নারীর এই গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা না হলেও পরমাত্মা ও মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সেখানেও রয়ে গেছে। বৈষ্ণব ধারণায় সৃষ্টিকর্তা কৃষ্ণই একমাত্র নর আর জীবমাত্রেই নারী। ঈশ্বরকে নর হিসেবে কল্পনার মধ্যে হয়ত আর্য পুরুষতান্ত্রিকতার আর্কেটাইপ লুক্কায়িত রয়েছে। একেশ্বরবাদীরা সাধারণত ঈশ্বরকে 'পুরুষবাচক সে' হিসেবে উল্লেখ করেন। এসব চিন্তা-চেতনার কারণে মানুষ প্রথাবদ্ধ ধারণার মধ্যে আটকে যায়। উত্তর-কাঠামোবাদী তাত্ত্বিক জ্যাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষকে এই অধিবিদ্যাকেন্দ্রিক ধারণা হতে মুক্ত করতে চেয়েছেন। অধিবিদ্যাজাত জ্ঞানের কারণে ঈশ্বরকে প্রভুর সমরূপে কল্পনার মাধ্যমে নারীর ওপরে উঠে আসে পুরুষের অবস্থান। কিন্তু সুফিবাদে ঈশ্বরকে নারী রূপে কল্পনা করা হয়েছে – এরূপ ধারণা ঈশ্বর/মানুষ, পুরুষ/নারী এই যুগ্ম-বৈপরীত্যকে বিনির্মিত করে দেয় যেখানে পুরুষের ওপরে উঠে আসে নারীর অবস্থান এবং ঈশ্বর ও নারীকে উপস্থিত করা হয় অসীম শক্তির ধারক হিসেবে। শুধু সুফিবাদে নয়; পরমাত্মাকে নারী হিসেবে কল্পনার এরূপ ধারণাটি কৃষিযুগেও প্রচলিত ছিল। নারী এবং জমি দুটোই উর্বরতা বা সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। মানুষের জীবনকে বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে উর্বরতার পবিত্র মূল্য রয়েছে। তাই উর্বরতা বা সৃষ্টির ধারণা থেকেই পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে নারীকে কল্পনা করা হয়েছে। *লায়লী-মজনু* কাব্যে এই পরমসত্তার প্রতীক লায়লী।

এজন্য কাব্যের পুরো আখ্যান জুড়ে লায়লীকে খুব সক্রিয় একটা চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। পুরো আখ্যান জুড়ে সংকট, উদ্ধত আচরণ – যা কিছু রয়েছে সবই লায়লীর সূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে; মধ্যযুগের একজন নারীর চরিত্র রূপায়ণে যা অপ্রত্যাশিত। লায়লী সমাজের সাথে লড়াই করেছে। কিন্তু লায়লীর বিবাহের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে যখন সে মজনুর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখন এই প্রত্যাখ্যান তাকে জীবনবিমুখ করেছে; লায়লী মৃত্যুর ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করেছে। লায়লীর এই মৃত্যুপ্রতিম কষ্টের মধ্যে মানবিক কাঠামো আছে। কাব্যের শেষ দিকে দেখা যায়, মজনুর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত লায়লী মানসিকভাবে শোকগ্রস্ত হয়ে দেহত্যাগ করেছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লায়লীর যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু লায়লীর এই মৃত্যু কাব্যের মানবিক কাঠামোকেও অস্বচ্ছ করে তুলেছে। লায়লীকে পরমাত্মা হিসেবে প্রতীকায়িত করায় লায়লীর মৃত্যু পাঠককে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। তাহলে লায়লীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরমাত্মার মৃত্যু ঘটেছে, পরমাত্মা কি তাহলে মৃত্যুর স্বাদ নিচ্ছেন? এখানে লক্ষণীয় যে, লায়লীর মৃত্যু মূলত পরমাত্মার মৃত্যু। স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, এ মৃত্যু নাস্তিকতা নয়; পরমাত্মা প্রেমের মধ্যেই বেঁচে আছেন। তার এই মৃত্যু বিরহযাপনের অবকাশ তৈরি করে, নতুন করে মিলন পিপাসার বন্ধন যোগায়। লায়লীর মৃত্যু লায়লীকে সর্বজনীন করেছে, তাঁকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হয়েছে। লায়লীর যতক্ষণ কায়া আছে, ততক্ষণ সে মানবিক। মৃত্যুর পর লায়লী কেবলই সুফিতত্ত্ব-ভারাক্রান্ত এক উপলব্ধি যাকে কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট।

লায়লী ও মজনুর পরিণতি : মানবিকতার সংকট

কাহিনির ধারাবাহিকতায় লায়লী জীবনমুখী; মজনু ভাববাদী। মজনুকে একজন ভাবুক হিসেবে দেখাতে গিয়ে কাব্যের শুরুতে বাহরাম খান মজনু চরিত্রকে বাসনাবিদ্ধ করে এঁকেছেন; যেখানে কবির গোপন লক্ষ্য যেন বাসনার মধ্য দিয়ে বাসনা পেরোনো স্তরে মজনুকে নিয়ে যাওয়া। তাই শিশু-বয়সী মজনুর মধ্যে কবি যৌবনানুগ আচরণের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আবার লায়লীর প্রতি মজনুর যে প্রেম তাও নিষ্কাম ছিল না। কিন্তু নজদ বনে লায়লী মজনুকে পরিণয়ের নিবেদন করলে মজনু তার প্রত্যুত্তরে যখন বলে –

> গুপ্ত রূপে তোহ্মাকে করিলে পরিণএ।
> আরব নগরে লোকে দুষিবে নিশ্চএ॥ (লায়লী ও মজনুর আলাপ)

তখন মজনুর প্রেম নিষ্কাম হয়ে যায়। এখানে সচেতনভাবে মজনু লায়লীকে ফিরিয়ে দেয়। এর মধ্যে মজনু সমাজ ও লোক-লজ্জার ভয় করলেও মজনুর ইন্দ্রিয় দমনের পরম ক্ষমতাও এখানে স্বীকার্য। যোগী হিসেবে তার তপস্যা, ধ্যানই মজনুকে এমন

সংযমী করে তোলে। এবং তার সাধনা যে সফল তার প্রমাণ লায়লীর বাড়ির দ্বারিক তাকে প্রহার করতে গিয়ে যে হাতে তরবারি তোলে সে হাত আর নামাতে পারে না। তাই দ্বারিক যখন বলে–

না জানিয়া পাপিষ্ঠে করিলুঁ এথ পাপ।
না চিনিয়া তোহ্মাকে দিলাম সন্তাপ॥
তুহ্মি ধর্ম কলেবর গুণের নিধান।
সদয় হইয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥ (লায়লী–সকাশে মজনু)

তখন মজনুর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আর প্রশ্ন থাকে না। এর আগে নজদ বনে যাওয়ার আগে মজনু ভিক্ষুক বেশে লায়লীর সাথে সাক্ষাতের এক পর্যায়ে মালিকের বাড়ির দ্বারিক কর্তৃক প্রহৃত হয়ে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু নজদ বনে দীর্ঘ সাধনার পর মজনু এমন এক অলৌকিক শক্তি অর্জন করে যে তাকে কেউ আর আঘাত করতে পারে না। শুধু তাই নয়, একজন ধর্মবন্ত ব্যক্তি হওয়ার কারণে ঘ্রাণশক্তির মধ্য দিয়ে লায়লীর কবরের সন্ধান পেয়েছিল মজনু। কিন্তু কবরের কাছে গিয়েই শোকে মজনুও তার জীবনের শেষ পরিণতিতে পৌঁছে যায়–

দুই ভুজ প্রসারিয়া কবর কোলেতে লৈয়া
প্রেমভাবে মজনু সুজন।
লায়লীর নাম ধরি হাহাকার শব্দ করি
ততক্ষণে তেজিলা জীবন॥ (মজনুর শোক)

লায়লীর কবরের কাছে গিয়েই লায়লীর মতো মজনুও অনন্তকালের জন্য নিঃসাড় ও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কবি তাঁর সচেতনতার জায়গা থেকেই লায়লী-মজনুর জীবনের এই চরম পরিণতি এঁকেছেন। বাহরাম খানের কাব্যে লায়লী-মজনুর বেঁচে থেকে জাগতিক মিলন সম্ভব ছিল না। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই লায়লী-মজনু দেহের সীমা ছাড়িয়ে অনন্তে মিশে যায়। কারণ মৃত্যু মানেই জীবনের অবসান নয়। প্লেটোর মতে, "জীবনের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর সঙ্কেত; আবার মৃত্যুও জীবনের নির্দেশক। এদের একটি ছাড়া অপরটি অচল। একটির পক্ষে অপরটি অপরিহার্য। শুধু মৃত্যুই যদি থাকতো তাহলে বিশ্বের গতি থেমে থাকতো। সুতরাং মৃত্যুকে অবশ্যই জীবনে রূপান্তরিত হতে হবে", (সূত্র: আমিনুল ইসলাম ২০০৯ : ১২৯) অন্যদিকে পরমাত্মা সম্পর্কিত মানুষের ধারণায়- "God was deeply mysterious and none of our human words or concepts could adequately express him but the soul had the capacity to know God, since it shared his divine nature"(Karen Armstrong, 1993 : 50)। বস্তুত, ঈশ্বরের ধারণাটাই অজ্ঞাত, আমাদের মানবীয় ভাষা বা ধারণা কোনোটাই তাঁকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু আত্মা

যেহেতু ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশীদার; সুতরাং, ঈশ্বরকে বোঝার ক্ষমতা রয়েছে তার। তাই মৃত্যুর পরও মানুষের আত্মা অমর থাকে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এমন অধ্যাত্মচিন্তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে *লায়লী-মজনু* কাব্যে কবি আশেক-মাশুক দুজনেরই মৃত্যু ঘটান। হয়তো বা সম্ভাব্য মিলনের পটভূমি তৈরি করেন। লায়লীর মৃত্যু কিছু সময়ের জন্য মজনুকে মানবিক করেছে, লায়লীকে হারানোর কষ্ট মজনু অনুভব করেছে। এ যন্ত্রণা নিয়ে যদি সে বেঁচে থাকত তাহলে কাব্যের মানবিকায়নের জায়গাটা শক্তিশালী হতে পারত। কিন্তু কাব্যের শেষে লায়লীর মৃত্যুর পর তার শোকে মজনুর মৃত্যু কাব্যকে ভিন্ন প্রবাহে চালিত করে; কাব্যের মানবিক কাঠামো বিমূর্ত হয়ে যায়। লায়লীর জন্য মজনুর মৃত্যুও সর্বজনীন ইঙ্গিত বহন করে। লায়লীর মৃত্যু লায়লীকে সর্বজনীন করলে লায়লীর জন্য মজনুর মৃত্যুও মজনুকে সর্বজনীন করেছে। তাই কবি বিশ্বাস করেন–

কবরেতে দুইজন বক্ষে বক্ষে সর্বক্ষণ
মজিয়া রহিব মন সুখে।
দুনিয়াতে পাইল দুখ কবরেত হৈব সুখ
নিজ প্রিয় লইবেন বুকে॥ (মজনুর শোক)

এই বিশ্বাস শুধু একজন কবির নয়; একজন সুফিরও। সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর পর মানুষ আল্লাহর মধ্যেই বিলীন হবে। "দেহের বন্ধন কাটাইলেই জীব-আত্মা ও পরমাত্মা সব এক হইয়া যায়। এই যে মিলন, এই মিলনই আমাদের শেষ মিলন, মানবজীবনের এইখানেই যবনিকা পতন। তার পর অন্য কিছু থাকিতে পারে না।... সীমা ছাড়াইয়া যে অনন্তে মিশিয়া গেল তাহার আর সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য কি? সে তখন সকল ভেদ-বিচারের অতীত সেই আল্লা'রই অঙ্গীভূত, তাহাতেই বিলীন।" (বরকতুল্লাহ্, ২০১১ : ৩৭) তাই *লায়লী-মজনু* কাব্য কবি আধ্যাত্মিকতার ধারণায় পৌঁছে দিতেই লায়লী-মজনুর মৃত্যু ঘটান। লায়লীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবি দেখিয়েছেন, ঈশ্বরকে হয় ওই কবরের মধ্যে অথবা মানবপ্রেমের মধ্যে দেখতে হবে। তাহলে ধর্মের পূর্ণ হয়ে ওঠার প্রত্যাশায় মানবিকতা ও মানুষিকতা খর্ব হচ্ছে। ধর্ম নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে মানবজীবনকে এঁটে দিতে চায়, কিন্তু সৃষ্টিশীল মানুষ তো জীবনের কাঠামোকে বারবার ভেঙে নতুন নতুন রূপে গড়তে চায়। লায়লী যখন নজদ বনে মজনুর কাছে এলো তখন আশেক-মাশুকের মিলন হতে পারত। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানবিক ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটানো হলো; ধর্ম বেঁচে রইল; পারত্রিক স্বপ্নপূরণের হাতছানিকে আশ্রয় করে।

দৌলত উজির বাহরাম খানের *লায়লী-মজনু* কাব্যে লায়লীর মৃত্যু ও তারই ধারাবাহিকতায় মজনুর মৃত্যু তাদের প্রেমের পথে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। মৃত ঈশ্বরের ছায়া হয়ে লায়লী এবং তার কবর মানবিকায়নের সংকটকে বহুমাত্রিক করে তোলে।

ফলে, *লায়লী-মজনু* কাব্যের পাঠ বহুব্যাখ্যাত হবার সামর্থ্যকে লালন করে চলে। কাব্যটি এমন এক দর্শন-জাল বিস্তার করে যেখানে লায়লী ও মজনু জীবদ্দশায় মিলিত হতে পারে না; অর্থাৎ, তাদের মানবিক অনুভবের বেদনা-বিধুর সমাপ্তি ঘটে। অথচ, মৃত্যু-পরবর্তী এক অপার্থিব মিলনের আশাবাদ যেন পাঠক কান পেতে শুনতে পায়। মানব-জগতের সীমা পেরোনো এই মিলনাকাঙ্ক্ষায় ভক্তের আত্মা তৃপ্ত হলেও রসজ্ঞ পাঠক সন্তুষ্ট হতে পারে না। ফলে, মানবিকতার মৃত্যু পাঠককে এই কাব্যের মধ্যে নতুন নতুন পাঠ-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে। বস্তুত, মাশুক লায়লীর মৃত্যু সুফি সাধকের কাছে পরলোকে মাশুককে পাওয়ার পথ সুগম করলেও তা *লায়লী-মজনু* কাব্যের কালোত্তীর্ণ আবেদনকে বহন করে চলে না। বরং মাশুকের এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে শিল্প-সংকট পাঠকের সম্মুখে প্রকট হয়ে ওঠে তাকে বারবার বিনির্মাণ করতে প্রণোদিত হয় আধুনিক পাঠক। কালের গহ্বর থেকে এই কাব্যে বার বার নতুন আলো ফেলে পরখ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এই সংকটাপন্ন মানবিকতার শিল্পসূত্র।

গ্রন্থপঞ্জি

আব্দুল হাফিজ (১৯৭৬)। *বাংলা রোমান্স-কাব্য পরিচয়*, মুক্তধারা, ঢাকা

আমিনুল ইসলাম (২০০৯)। *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ওয়াকিল আহমদ (২০১২)। *বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা

ক্ষেত্রগুপ্ত (২০০১)। *প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

জগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯৮৮)। *গীতাঞ্জলি: অস্তিত্ব বিরহ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

দৌলত উজির বাহরাম খান (২০১৪)। *লায়লী-মজনু*, আহমদ শরীফ (সম্পা.), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

ভীষ্মদেব চৌধুরী (২০০৪)। *বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা

মুহম্মদ আবদুল হাই, ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত (২০১০)। *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মুহম্মদ এনামুল হক (২০১৫)। *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ (২০১১)। *পারস্য প্রতিভা*, সাহিত্য প্রকাশনালয়, ঢাকা

সালাহউদ্দীন আইয়ুব (১৯৯৬)। *অরিয়েন্টালিজম ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক বিতর্ক*, দেশ প্রকাশন, ঢাকা

Karen Armstrong (1993). *A History of God*, The Random House Publishing Group Ballantine Book-New York

Terry Eagleton (2008). *Literary theory: An Introduction*, Reprint by Wiley India